সরকারী ঋণ মুদ্রাসরবরাহ এবং মূল্যস্তর পরিবর্তনে মূখ্য উপাদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আবু আহমেদ*

পিছনের কথা

এখন থেকে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে আধুনিক মুদ্রাতত্ত্ববিদদের নেতা নবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যান বলেছিলেন, উন্নত দেশের জন্য সর্বোত্তম নীতি হলো মুদ্রাকে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখা,[১] এবং সেজন্য তিনি মুদ্রার সম্প্রসারনকে স্থিরগতিতে বাড়াতে বলেছিলেন, তাঁর মতে এ স্থিরগতি হচ্ছে বৎসরে ৩ থেকে ৫ শতাংশ।[২] তিনি মুদ্রা বাড়ানো কমানোর মাধ্যমে কোন রকম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হাসিল, কিংবা পুনর্নিয়োগ মাত্রা অর্জনের বিরোধিতা করেছিলেন।[৩] অনুন্নত দেশের জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে, অনুন্নত দেশের জন্য সর্বোত্তম নীতি হবে অন্য বৃহৎ কোন স্থিতিশীল দেশের মুদ্রার সংগে নিজের মুদ্রাকে বেধে দেয়া যার সংগে এর অর্থনৈতিক নৈকট্য-সম্পর্ক বেড়েছে। তবে তাঁর মতে দ্বিতীয় সর্বোত্তম নীতি হবে অনুন্নত দেশের জন্যও উন্নত দেশের ন্যায় একটি স্থিতিশীল (steady) মুদ্রানীতি অনুসরণ করা,[৪] তা না হলে অর্থনীতিকে অনিশ্চয়তা এবং মুদ্রাস্ফীতির মাঝে ঠেলে দেয়া হবে।[৫]

মিলটন ফ্রিডম্যানের এ বক্তব্য এসেছিলো তখন যখন পৃথিবীময় যুদ্ধোত্তর সময়ে কিন্সীয় মতবাদের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিলো। প্রায় সব তরুণ অর্থনীতিবিদই তখন কিন্সীয় ধারায় উদ্দিপ্ত এবং উধবুদ্ধ।

কিন্সের সাফল্যকে খাটো করে দেখার উপায় ছিলো না, যুদ্ধ পূর্ব সময়ে ১৯৩০ দশকের দীর্ঘমেয়াদী মন্দায় পশ্চিমা জগত, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, যখন হাবুডুবু খাচ্ছিলো তখনই পেশ করা হয়েছিলো তাঁর নতুন ধারণা এবং বিশ্লেষণ যা অনেকের মতে মন্দাকে কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছিলো। যুদ্ধ পর সময়ে কিন্সীয় ধারণা ও বিশ্লেষণ-

* অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গুলো একত্রে মিলে জন্ম দিলো আজকের অর্থনীতির সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা—ম্যাক্র অর্থনীতি (Macro economics)।

কিন্‌স তাঁর ধারণা ও বিশ্লেষণগুলো পেশ করলেন পূর্ব থেকে পোক্ত হয়ে আসা মুদ্রার পরিমাণতত্ব ও ওয়ালরাসের সাধারণ ভারসাম্য মডেলের বিপরীতে। এ দুটো তত্ত্বই ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির মূলভিত্তি—যার মূল ম্যাসেজ হলো, বাজারকে আপন পথে কাজ করতে দিলে অর্থনীতি আপনা আপনিই পূর্ণনিয়োগে পৌঁছে যাবে—এর জন্য বাহির থেকে হস্তক্ষেপের দরকার নেই।[৫] তিরিশের মহামন্দা এ দুটো তত্ত্বের কার্যকারীতাকে সন্দিহান করে তোলে, এবং এ অকার্যকারীতার প্রেক্ষাপটেই কিন্‌সীয় বিশ্লেষণের আবির্ভাব। তবে ক্লাসিক্যালদের এ দুর্দিনে কিন্তু নতুন মুদ্রাতত্ত্ববাদীরা বসে থাকেন নি। মিলটন ফ্রিডম্যান এবং শিকাগোতে তাঁর অন্য সহযোগীরা সেই পঞ্চাশ দশক থেকেই বলে আসছিলেন কিন্‌সীয় ধারণার অসারতার কথা।[৬] তখন কেউ তেমন আমল দেয়নি, আমল দেয়া শুধু করেছে সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে—যখন পশ্চিমা অর্থনীতিতে আবার আর এক ধরণের দীর্ঘস্থায়ী মন্দা অনুভূত হতে লাগলো। অবশ্য এর মধ্যে মিলটন ফ্রিডম্যান তাঁর সমর্থনে কিছু নবীন এবং মেধাবী অর্থনীতিবিদদেরকে সহযোগী হিসাবে পেলেন্, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন টমাস সার্জেন্ট এবং এন, ওয়ালেস। তাঁরা যে তত্ত্ব দিলেন তার‍্যাসনাল আশাবাদ (Rational expectation) নামে পরিচিত।[৭] এ মতবাদের মৌলিক চেতনা কিন্তু মুদ্রাতত্ত্ববাদীদের মৌলিক অবস্থানকে দারুণভাবে সমর্থন করলো। আজকে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য উভয় দেশেই রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তন হয়েছে, রক্ষণশীলরা ক্ষমতায় আসীন। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের সংগে মুদ্রাতত্ত্ববাদীদের মতামতের দারুণ মিল খুঁজে পান, এবং আজকে নবরূপে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদেরই স্বর্ণ যুগ যাচ্ছে বলা চলে।

আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মিলটন ফ্রিডম্যানের কথা অনুযায়ী মুদ্রা কিভাবে অস্থিতিশীলতার বাহন হতে পারে তা দেখানো নয়, কারণ সেভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে ক্লাসিকাল কাঠামোয় পা দেয়া ছাড়া উপায় নেই, আমাদের উদ্দেশ্য হলো বিপরীত কাঠামো গ্রহণ করলেও মুদ্রা কিভাবে অস্থিতিশীলতার উপাদান হিসাবে কাজ করছে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তা দেখানো। বস্তুতঃ বিপরীত কোন কাঠামোই মুদ্রা সরবরাহকে লাগামহীন করার কথা বলেনি—যা বলেছে তা হলো কিছুটা উদার নৈতিক মুদ্রনীতি অনুসরণ করার কথা।

মুদ্রা সরবরাহের নিয়ম

মুদ্রা সরবরাহের ব্যাপারে দুটো নিয়ম মুখ্যত অর্থনীতিতে পরিচিত এবং দুটোই আবার বিতর্কিত। একটি হলো মন্দা-বিরোধী (Counter Cyclical) মুদ্রানীতি, অন্যটি হলো, 'নিয়মানুযায়ী' মুদ্রানীতি। প্রথমটির প্রবক্তরা হচ্ছেন কিন্সীয় অর্থনীতির সমর্থক, আর দ্বিতীয়টির প্রবক্তরা হচ্ছেন মিলটন ফ্রিডম্যানের অনুসারীরা। মন্দা-বিরোধী মুদ্রানীতির পক্ষে যারা মতামত দিয়েছেন তাঁদের প্রধান যুক্তি হলো, অনেক দেশেই মুদ্রার চাহিদা অস্থিতিশীল, সুতরাং চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুদ্রা সরবরাহকে উঠানামা করানো যুক্তি সংগত। তারা এই নীতিকে বলতে চেয়েছেন "বাতাসের বিরুদ্ধে হেলান দেয়ার (Leaning against the winds) 'নীতি।" কিন্তু মিলটন ফ্রিডম্যান এ নিয়ম মানতে রাজী নন,—তাঁর মতে অনেক দেশে মুদ্রা সরবরাহ মন্দা-বিরোধী না হয়ে বরং মন্দার পক্ষে হয়েছে।[৮] ফ্রিডম্যান এ তত্ত্বের বিরোধীতা করতে গিয়ে অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের ল্যাগ্স এর (Lags) কথা উল্লেখ করছেন। বিরোধীতার অন্য কারণ জনগণ আগে ভাগেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা-নীতির ব্যাপারে কি করতে যাচ্ছে তা আঁচ করতে পারে এবং সে অনুযায়ী নিজদের পোর্টফলিওকে সুবিন্যস্ত করে নেয়, যার ফলে, এমন কি, স্বল্প মেয়াদেও মুদ্রাসরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়।[৯] এ শেষোক্ত বিষয়টির পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন সার্জেন্ট (১৯৭৫) এবং ওয়ালেস (১৯৭৫)।[১০]

অনুন্নত দেশে সরকারী ঋণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং মুদ্রাস্ফীতি

অনুন্নত দেশসমূহের অবস্থা ভিন্ন—এ সব দেশে সচেতনভাবে মন্দা বিরোধী বা বিধি অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি এ দুয়ের কোনটিকেই অনুসরণ করা হয় না। এসব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে যা মুদ্রা ছাড়ে কিন্তু ছাড়কৃত মুদ্রার মান বজায় রাখতে দারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়, যার প্রতিফলন দেখা যায় বিভিন্ন দেশে উঁচু হারে মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে।[১১] মুদ্রার মান বজায় রাখার ব্যর্থতার মুখ্য কারণ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, এবং যখন তখন ঢালাওভাবে সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা। সরকারী ঋণ গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে অর্থনীতিবিদেরা মুখ্যত দুটো কারণকে উল্লেখ করেছেন, প্রথমতঃ এসব দেশে কর ভিত্তি (Tax-base) ছোট, যার কারণে নূতন করারোপ করে অতিরিক্ত অর্থ তোলা কঠিন হয়ে পড়ে, দ্বিতীয়তঃ এসব দেশে ঋণপত্রের বাজার ছোট থাকার দরুণ সরকার ঋণপত্র বিক্রয়

করে প্রয়োজনীয় অর্থ তুলতে ব্যর্থ হয়। ফলে অন্য বিকল্প—কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব দেশে প্রায় সরকারই তাদের রাজনৈতিক ওয়াদা পূরণার্থে এবং নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজসমূহ সমাধান করার জন্য আয়ের থেকে ব্যয় বেশী করে থাকে এবং ফলে ঘাটতি ব্যয়ের সম্মুখীন হয়। এ ঘাটতি ব্যয় মেটাতে যে অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার করা হয় তা বাজারে অনাকাংক্ষিত অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ করে, যা পরে মূল্য স্তরের উপর চাপ সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যে মুদ্রা ঋণ করে বাজারে ছাড়া হয় তাকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা বলা হয় (high-powered money)। এ মুদ্রা প্রকৃত পক্ষে বাজারে কত অর্থের যোগান দেবে তা নির্ভর করবে অর্থগুণকের (Money multiplier) উপর।[১২] অর্থাৎ অর্থগুণকের সংগে পূরণ হয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা বাজারে প্রকৃত মুদ্রার যোগান সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারটির উপর এ জন্যেই জোর দেয়া প্রয়োজন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ করার ফল, আর ঋণপত্র বিক্রয় করে নন-ব্যাংক পাবলিক থেকে ঋণ করার ফল, এক নয়। পরেরটিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা কম থাকে, আর পূর্বটিতে এটি ষোল আনা বজায় থাকে।[১৩]

বাংলাদেশে মুদ্রানীতি

বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। একে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মুদ্রা ছাড়া এবং মুদ্রার মান রক্ষা করার জন্য।[১৪] তবে বাংলাদেশে আজও মুদ্রাস্ফীতি কোন মৌলিক দিক-দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি। এখানে সুষ্ঠু মুদ্রানীতির পক্ষে যে সব উপাদান-গুলো উপস্থিত থাকা দরকার সেগুলো অনুপস্থিত। উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীনতা, পূর্ব থেকেই ঘোষিতনীতি, বিভিন্ন ম্যাক্রো চলক-গুলোর পরিমাপ, ঘোষিত নীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য তৎপরতা ইত্যাদি।

এখন যেভাবে মুদ্রানীতি অনুসরন করা হচ্ছে তাকে এ্যাডহক ভিত্তি-তেই মুদ্রানীতি অনুসরণ করা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে মুদ্রানীতির ব্যাপারে তথ্য ও তত্ত্ব পাবার তেমন কোন ভাল উৎস নেই। ছিটাফোটা যা পাওয়া যায় সেগুলোকে একত্রে গণ্য করলে এখানে সুসামঞ্জস্যশীল কোন মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। উৎস-গুলো হলো ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্ট, অর্থনৈতিক ইন্ডিকেটরস, অর্থ-

নৈতিক ট্রেন্ডস্, ব্যক্তি পর্যায়ে রচিত রচনাবলী, প্ল্যান দলিল সমূহ ইত্যাদি। প্ল্যান দলিল সমূহে পরিস্কার কিছু থাকে না উদ্দেশ্যের ব্যাপারে, কেবল কথার মারপ্যাচ দ্বারা কোন কিছুকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার চেষ্টা করা হয়। ম্যাক্রো চলকগুলোর পরিমাপের ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ আজও গ্রহণ করা হয়নি। এ চলকগুলোর অন্যতম হলো মুদ্রায়ন (monetization) হার এর মুদ্রাগুনক (Money Multiplier), মূল্যান্তর। প্রথমোক্ত দুটো চলক মুদ্রানীতি প্রনয়ণের জন্য অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়টি মুদ্রানীতিকে সামঞ্জস্যশীল করার জন্য প্রয়োজনীয়। মুদ্রানীতির ব্যাপারে সামগ্রীক মুদ্রাকে (monetary aggregates) কে টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এতে অসুবিধে আছে বাস্তবায়নের বেলায়। খোলাবাজার নীতি চালু থাকলে এ নীতি কার্যকরণ করা সহজ, নইলে সুদের হার আর ঋণ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে এ নীতিকে কার্যকর করা মুশকিল। সেজন্য বিকল্প হিসেবে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রাকে টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে বলে এ লেখক অভিমত ব্যক্ত করছে। এ ক্ষেত্রে অর্থগুণকের মান জানতে হবে আগে থেকেই, যদি ধরে নেয়া যায় যে অর্থগুণক একটা সময়ব্যাপী স্থির থাকে এবং স্থির থাকার যথেষ্ট কারণও রয়েছে, তা'হলে এ নীতি কার্যকর করতে সুবিধে। আমরা নিম্নে মুদ্রা সরবরাহের কারণগত উপাদান (Causative factors) গুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং এগুলোর আলোকে বাংলাদেশের প্রকৃত ও কাংখিত মুদ্রা সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরবো।

মুদ্রা সরবরাহের কারণগত উপাদানগুলো এবং বাংলাদেশে কাংখিত ও প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ ঃ

মুদ্রার চাহিদার দিকও রয়েছে। এবং এ চাহিদার দিক নির্ধারিত হয় সাধারণতঃ জাতীয় আয় বর্ধন, সুদের হার, এবং অর্থনীতিতে নুতন মুদ্রায়ন (monetization) দ্বারা। এর বাইরেও একটি উপাদান মুদ্রা সরবরাহের কারনিক উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে, তাহলো 'অনুমোদিত (permissible)' মূল্যান্তর বৃদ্ধি।[১৬] অর্থাৎ, ধরে নেয়া হয়েছে যে একটি সহনশীল স্তর পর্যন্ত মূল্যান্তরকে বাড়তে দেয়া হবে। সুদের হার উন্নত দেশগুলোতে অর্থ চাহিদার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করে, তবে অনুন্নত দেশে এর প্রভাব তেমন দেখা যায় না, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদের হারের স্থিরিকরনের কারণে এবং অনুন্নত অর্থবাজার বজায় থাকার দরুন। বাংলাদেশে

অধ্যয়ন করে দেখা গেছে যে, সুদের হারের তেমন কোন প্রভাব নেই অর্থ চাহিদার উপর।[১৭] মুদ্রায়ন উন্নত দেশে তেমন উল্লেখযোগ্য উপাদান নয় অর্থ চাহিদা হবার পক্ষে, তবে অনুন্নত দেশে এর ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না। একটি অধ্যয়নে বাংলাদেশে এ হারকে উল্লেখ করা হয়েছে ১'৪% হারে, তবে কোন কারণ বা সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।[১৮] ভারতের জন্য চান্দভারকার এ হারকে প্রতি বৎসর ১% বলে উল্লেখ করেছেন তার অধ্যয়নে।[১৯] আমরা এ হারকে বাংলাদেশের জন্য ব্যবহার করতে পারি। অন্য দুটো উপাদান জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং অনুমোদিত মূল্যস্তর বৃদ্ধি হচ্ছে প্রজেক্টের বিষয়, এবং এ দুটো পরিমাণের হিসেব সরকারী দলিল পত্রে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমরা যদি দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা সময় ধরি তা'হলে এ হার দুটো হলো যথাক্রমে ৫'৪%এবং ১০% প্রতি বৎসর করে। অবশ্য শেষোক্তটি কিসের ভিত্তিতে ধরা হয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই দলিলে।[২০] সুদের হারকে বাদ দিয়ে উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে আমরা মুদ্রার চাহিদার দিককে হিসেব করতে পারি। এবং সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে কাংখিত মুদ্রার চাহিদাকে একটি সমতা-সমীকরন হিসেবে লিখতে পারি।

$\% \triangle MS_D$ (কাংখিত মুদ্রাসরবরাহের পরিবর্তনের হার) $= \triangle M_{2D} = \% \triangle GDP + \% \triangle P + \% \triangle M_n$ ... ... (১ ক)

$\% \triangle MS_D = \triangle M_{2D} = 5{\cdot}4 + 10 + 1 = 16.4\%$ .... (২ খ)

এ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য কাংখিত মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ হবে বাৎসরিক ১৬'৪%। কিন্তু আমরা যদি পরীক্ষা করি তাহলে দেখবো প্রকৃত অর্থ সরবরাহ এ হারকে বহুলাংশে ছেড়ে গেছে। নিম্নে আমরা ১ নং-টেবিলে কাংখিত মুদ্রা সরবরাহের এবং প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ দেখাব।

এ টেবিলে উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে গড়ে ১৯৮০-৮৬ সময়ে প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহ বেড়েছে ২৫'৩ % হারে। অথচ কাংখিত মুদ্রা সরবরাহ বাড়ার প্রয়োজন ছিলো ১৬'৪% হারে। এ শতকরা বৃদ্ধিকে হিসেব করা হয়েছে পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহকে ভিত্তি বৎসর ধরে, পূর্ববর্তী বৎসরের কাংখিত মুদ্রা সরবরাহকে ভিত্তি বৎসর ধরলে এ হার আরও অনেক বেশী হবে।

টেবিল—১

কাংখিত ও প্রকৃত মুদ্রাসরবরাহের মধ্যে পার্থক্য

(টাকা ঃ কোটির হিসেবে)

সন	m_{2D} (কাংখিত মুদ্রা সরবরাহ)	m_{2a} (প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহ)	% $\triangle$ in m_{2a} (প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহ শতকরা হিসেবে)
১৯৮০-৮১	৩৭৭৭·০০	৪১০৬·০০	২৭·৪৫
১৯৮১-৮২	৪০৯৬·৬০	৪৫৪৮·৭০	৯·৯৭
১৯৮২-৮৩	৫১১৭·৬৭	৫৮৯৮·২০	২৯·৬৬
১৯৮৩-৮৪	৫৯৫৫·৯৬	৮৩৮৫·৮০	৪২·১৮
১৯৮৪-৮৫	৬৯৩৩·৯০	১০৫৩৪·২০	২৫·৬১
১৯৮৫-৮৬	৮০৭৯·০৬	১২৩৩৪·১০	১৭·১২

গড় বৃদ্ধি ২৫·৩%

উৎস ঃ নভেম্বর '৮৬ এর ইকনমিক ট্রেন্ডস' এ দেয় পরিসংখ্যান অবলম্বনে।

সরকারী ঋণ এবং বর্ধিত মুদ্রাসরবরাহ

এখন আমরা বিশ্লেষণ করবো কেন এ বাড়তি মুদ্রা সরবরাহ সংঘটিত হলো। অন্যকথায় বাংলাদেশ ব্যাংক কি প্রকারে এ অর্থ যোগান দিলো তাও দেখবার বিষয়। মোট মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ হলো মুদ্রা-গুণক গুণ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা (high-powered Money) অর্থাৎ সাংকেতিক ভাবে সরবরাহ সমীকরণকে লেখা যায়,

$M_2 = m^2 H^{২১}$, ... (২)

(অথবা, $m_2 = \frac{M_2}{=H}$ এবং $H = \frac{M_2}{m_2}$)

যদি মুদ্রা গুণককে (m_2) আমরা স্থির ধরি, যার কারণও রয়েছে, তাহলে কাংখিত মুদ্রা সরবরাহ নির্নিত হবে কাংখিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা (H_D) দ্বারা, অর্থাৎ আমরা কাংখিত মুদ্রার সমীকরণকে (M_{2D}) সংক্ষেপে লিখতে পারি

$M_{2D} = M_2 H_D$ ... ... (৩)

হিসেবে। কাংখিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রার হের-ফের হলে কাংখিত মুদ্রা সরবরাহেও তারতম্য হতে বাধ্য। নিম্নে টেবিলে আমরা কাংখিত

টেবিল—২

(অতিরিক্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রাসরবরাহের হার) কোটি টাকার হিসাব

সময়	M_{2D}	H_D	H_a	অতিরিক্ত H শতকরা হিসেবে
১৯৮০-৮১	৩৭৭৭'১৮	৮৩৯'৩৭	১৩০৫	৫৫'৫০
১৯৮১-৮২	৪০৯৭'৬৩	৯৭৭'০২	১২৬৬'৭	২৯'৬৫
১৯৮২-৮৩	৫১১৭'৬৭	১১৩৭'২৬	১৫৪৩'০০	৩৫'৬৭
১৯৮৩-৮৪	৫৯৫৬'৯৬	১৩২৩'৭৬	২১৯৭'৮	৬৬'০২
১৯৮৪-৮৫	৬৯৩৩'৯০	১৫৪০'৮৬	২৬১১'৯	৬৯'৫
১৯৮৫-৮৬	৮০৭১'০৬	১৭৯৩'৫৫	২৯৬৭'৩	৬৫'৪৪

(অর্থনৈতিক ট্রেণ্ডস নভেম্বর ১৯৮৬তে দেয় পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে তৈরী)। যেখানে M_{2D} = কাংখিত মুদ্রা সরবরাহ, H_D = কাংখিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা সরবরাহ, H_a = প্রকৃত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা সরবরাহ।

উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা এবং প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরলাম। কাংখিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রাকে হিসেব করা হয়েছে মুদ্রা গুণক (m_2) এর গড় মান ৪'৫ ধরে।[২২]

এ টেবিলে দেয় পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে কাংখিত উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রার মধ্যে এবং প্রকৃত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে ছেড়ে গেছে গড়ে প্রায় ৫৪% হারে। একটি ব্যাখ্যা যা ইতিপূর্বে দেয়া হয়নি তা হলো উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন মুদ্রাকে অর্থনীতির নগদ ভিত্তি (cash base of the economy) বলে, একে মোট রিজার্ভ মুদ্রা (reserve money)ও বলে। এটিই যেহেতু মোট মুদ্রা যোগানের মুখ্য উৎস সেজন্য এ অর্থকে বীজ মুদ্রা বলেও আখ্যায়িত করা হয়। যা হোক, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রাই যে মোট মুদ্রা সরবরাহের একমাত্র নিয়ামক তা আমরা বলবো না। এর সংগে যোগ হয় অর্থগুণক, এবং এ দুয়ের আন্তক্রিয়ার (interaction) ফল। অর্থাৎ, আমরা মোট মুদ্রা সরবরাহ সমীকরণকে ভেংগে লিখতে পারি ৩টি অংশের যোগফল হিসেবে

$$\frac{\triangle M_2}{M} = \frac{\triangle H}{H} + \frac{\triangle m_2}{m_2} + \frac{\triangle H \triangle m_2}{H m_2} \quad \cdots \cdots \cdots (৪)$$

এ সমীকরণকে আমরা হিসেব করতে পারি যার ফল দেয়া হল টেবিল ৩ এ (টাকা কোটির অংকে)

টেবিল—৩ মোট মুদ্রাসরবরাহে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা এবং মুদ্রাগুণক পরিবর্তনের অবদান

	সময় ১৯৮০-৮১	সময় ১৯৮৭-৮৫
M_2	৪১৩৬.০০	১০৫৩৪.২
H	১৩০৫.৩	২৬১১.৯
m_2	৩.১৬	৪.০৩

এবং এর থেকে পাওয়া যায় ঃ- $\frac{\triangle M_2}{M_2} = 1.54$, $\frac{\triangle H}{H} = 1.00$,

$\frac{\triangle m_2}{m_2} = .27$ $\quad \frac{\triangle H \triangle m_2}{H m_2} = .27$

অর্থাৎ ১৯৮০-৮৫ সময়ে মোট মুদ্রা সরবরাহ বেড়েছে ১৫৪%,

এর মধ্যে শুধুমাত্র উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পাবার দরুনই এটি বেড়েছে ১০০% আর বাদ বাকী ৫৪% বেড়েছে সমহারে অর্থ-গুণকের পরিবর্তনের দরুন এবং অর্থগুণক ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অর্থের আন্তক্রিয়া দ্বারা।

এখন আমরা আসি কেন এ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা কাংখিত হারের চেয়ে বেশী বেড়েছে সে সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা তিন কারণে বাড়তে পারে,—অন্ততঃ বাংলাদেশে এ তিন কারণে এ সংঘটিত হয়ে থাকে। এ তিন কারণ হলো, সরকারকে ঋণ দেয়া, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়া এবং আন্তর্জাতিক সম্পদ ধারণে (international assets holding) পরিবর্তন হওয়া। সংক্ষেপে এ মুদ্রার পরিবর্তন সমীকরণকে আমরা লিখতে পারি,

$$\triangle H = \triangle CG + \triangle FA + \triangle OFIs \quad \ldots \cdots (5).$$

যেখানে,

$\triangle H$ = উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রায় পরিবর্তন,

$\triangle CG$ = কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে দেয় ঋণের পরিবর্তন,

$\triangle FA$ = বৈদেশিক সম্পদ ধারণের পরিবর্তন,

$\triangle OFIs.$ = অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেয় অর্থের পরিবর্তন।

আমরা বৈদেশিক সম্পদ ধারণকে যদি বাদ দেই (কারণ দীর্ঘ-মেয়াদে এ পরিবর্তন হার শূণ্য হবার সম্ভাবনা বেশী) আর অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেয় ঋণকে সরকারী ঋণ মনে করি, (কারণ এ ধরনেরও অধিকাংশ অংশ সরকারী নির্দেশে দেয়া হয়) তাহলে উক্ত সমীকরণ দাঁড়ায়—

$$\triangle H \;=\; -\; CG \quad \ldots\ldots (6)$$ এ,

এখন, CG যদি দরকার হয় সরকারী ঘাটতি পূরণ করতে (ধরে নেয়া হলো সরকার ঋণ পত্র বিক্রয় করে ঘাটতি মেটাতে অক্ষম) তাহলে উপরোক্ত সমীকরণকে লিখতে পারি—

$\triangle H = GD$ (সরকারী ঘাটতি) ... ... (7)

এবং এক্ষেত্রে মুদ্রা সরবরাহ সমীকরণ (২) দাঁড়ায়

$M_2 \;-\; m_2\ GD,$ (H এর স্থলে GD বসিয়ে) ... . (8)

এখন আমরা দেখি প্রকৃত উচ্চক্ষমতা মুদ্রার (Ha) কত অংশ সরকারকে ঋণ হিসেবে দিতে গিয়ে প্রয়োজন হয়েছে, (টেবিল-৪)

এ টেবিল থেকে দুটো বিষয় বোঝা যায়; সরকারকে দেয় ঋণের পরিমাণ হচ্ছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রার সিংহভাগ, যা গড়ে ১৯৮০-৮৬

টেবিল—৪

(প্রকৃত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা সরবরাহ সরকারী ঋণের হার)
(টাকা কোটি অংকে)

সময়	Ha প্রকৃত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা	CG (সরকারকে দেয় H)	সরকারকে দেয় ঋণ % হিসেবে
১৯৮০-৮১	১৩০৫˙৩	১২২০˙১	৯৩˙৪৮
১৯৮১-৮২	১২৬˙৬৭	১২০৬˙৮	৯৫˙২৭
১৯৮২-৮৩	১৫৪৩˙০	৯৬২˙১	৬২˙৩৪
১৯৮৩-৮৪	২১৯৭˙৮	৯২৪˙৭	৪২˙০৭
১৯৮৪-৮৫	২৬১১˙৯	৯৭২˙৯	৩৭˙২৪
১৯৮৫-৮৬	২৮৬৩˙৩	১০২২˙১	৩৪.৪৪

গড় ৬০˙৮০

(উৎস ঃ অর্থনৈতিক টেন্ডস, নভেম্বর, ১৯৮৬)।

সময়ে ৬০˙৮০ শতাংশ; দুই, এ ঋণের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসছে। কমাটা এ জন্যই হয়ে থাকবে যে সরকার তার নিজের অধীনের অনেক শিল্প কারখানার বেসরকারী খাতে স্থানান্তরিত করেছে, এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মও কমিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও বিগত বৎসরগুলোতে সরকার করারোপ বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং সামান্য অর্থ বন্ড ইত্যাদি বিক্রয় করেও তোলার প্রয়াস পেয়েছে।

অতিরিক্ত মুদ্রা সম্প্রসারণ এবং মূল্যস্তরের উপর এর চাপ

স্বাভাবিক কারণেই কাংখিত মুদ্রা সরবরাহ অপেক্ষা অধিক মুদ্রা বাজারে সরবরাহ করা হলে তার চাপ মূল্যস্তরের উপর পড়তে বাধ্য। আমরা আমাদের সমীকরণ (১) কে লিখেছি অনেকটা মুদ্রার পরিমাণ-তত্ত্বের কাঠামোয়। এর থেকে পরিস্কার বুঝা যায় ডান দিকের চলকগুলোর কোন একটি কমলে সে পরিমাণ ডানদিকের অন্য আর একটি চলকের বৃদ্ধি পেলে সমতা বজায় সম্ভব। বাস্তব অবস্থায় দেখা যায় যে আমাদের জাতীয় আয় প্রজেকটেড হারে বাড়ে নি, আশা করা গিয়েছিলো তা ৫˙৪% হারে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা সময়ে বাড়বে, কিন্তু বেড়েছে ৩˙৮% হারে। সংগত কারণেই প্রজেক-

টেড মুদ্রা সরবরাহ কমা উচিত ছিলো, কিন্তু তা না কমে বেড়েছে। এ অবস্থায় বাড়তি চাপকে সহ্য করতে হয়েছে ডানদিকের অন্য চলক মূল্যস্তরকে, কারণ অন্য আর এক চলক মুদ্রায়নকে আমরা স্থির হিসেবে গণ্য করে আসছি। বাড়তি চাপ সহ হিসেব করলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত প্রতি বৎসর গড়ে ২২·১৭% হারে, ২৬·৯৭% মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির বিপরীতে। নিচে আমরা ১৯৮০-৮৫ সময়ের জন্য জানানো বা জ্ঞাত করানো মূল্যস্তর (reported price level), এবং হিসেবকৃত (estimated) মূল্যস্তর পেশ করলাম।

সময় ঃ ১৯৮০-৮৫

গড় মুদ্রা সরবরাহ এর বৃদ্ধি (%)	জাতীয় আয়ের প্রকৃত বৃদ্ধি (%)	হিসেবকৃত মূল্যস্তর বৃদ্ধি (%)	জ্ঞাত করানো মূল্যস্তর বৃদ্ধি (%)	মুদ্রায়ন বৃদ্ধি (%)
২৬·৯৭	৩·৮	২২·১৭	১০·৬৯	১

এর থেকে এ বোঝা যায় যে প্রকৃত মূল্যস্তর বৃদ্ধি জনগণকে জ্ঞাত করা মূল্যস্তর থেকে অনেক বেশী। অবশ্য আমাদের হিসেব করা মূল্যস্তর হচ্ছে সাধারণ মূল্যস্তর, আর জ্ঞাত করানো মূল্যস্তর হচ্ছে ভোক্তার জীবন যাত্রার ব্যয় পরিবর্তন সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরী। তবুও মনে হয় ফাঁকটা অনেক বেশী।

অতি মাত্রায় মূল্যস্তর অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তন্মধ্যে এর প্রধান বলি হলো বিশ্বাস (confidence) কে নাড়া দেয়া। বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যান্য মেক্রোচলকগুলি আপনা আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। নিরেট অর্থনৈতিক হিসেব নিকেশের আলোকে দেখা যায় অতি মুদ্রাস্ফীতি আয় উপার্জনকারীর পোর্টফলিওতে এমন কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে যা অর্থনীতির জন্য মোটেই কাম্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যায় উদ্বৃত অর্জনকারীর সঞ্চয়ের রূপকে উদ্বৃত্ত অর্জনকারী সঞ্চয় করলো ঠিকই কিন্তু তা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে নয়, করলো প্রকৃত সম্পদ ধারন করে, যেমন জমি, সোনা, কিংবা বাড়ির ফিটিংস ইত্যাদি ক্রয় করে। ফলে তার সঞ্চয় পুনব্যবহারের জন্য পাওয়া গেল না। সঞ্চয়তে সুদের হারের একটি ভূমিকা আছে। সেটি উন্নত বিশ্বে বেশ জোরালো, আমাদের দেশেও এটি অবশ্য বিবেচনীয়। প্রকৃত সুদের হার ও মুদ্রাস্ফীতির বিয়োগ ফল, তা অবশ্যই ধনাত্মক হতে হবে যদি সুদের হারকে সঞ্চয়ে কোন রকম ভূমিকা দিতে

হয়। আমাদের দেশে দুবার সুদের হার বাড়ানো হয়েছে, একবার অক্টোবর ১৯৮০তে, আর একবার জানুয়ারী ১৯৮৫তে, সুদের হারের মাধ্যমে সঞ্চয়কে উৎসাহ দেবার জন্য। কিন্তু আমাদের উপরে হিসেবের নিরিখে দেখা যায় এ ক্ষেত্রেও সুদের আসল হার ধনাত্মক হয়ে রয়েছে। শুধু যে সঞ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় অতি মুদ্রাস্ফীতি জনিত অর্থনীতিতে তা নয়, মূলধনও বিদেশে পাড়ি জমায়।[২৪] মূলধনের কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই, থাকলেও অতি দুর্বল, আইন প্রয়োগ করে একে নির্দিষ্ট বাউন্ডারীতে ধরে রাখা মুসকিল; মূলধন যদি বাইরে ভাল মুনাফা পায় তা হলে সেখানে চলে যেতে চাইবে বৈকি।

উপসংহার এবং সারাংশ

সরকারী ঋণ উদ্ভূত অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচার প্রাথমিক উপায় হলো বাংলাদেশ ব্যাংককে স্বাধীনতা দেয়া, যাতে করে এই ব্যাংক স্বাধীনভাবে মুদ্রাস্ফীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৎসরে সময় সময়ে প্রকাশ্যে জনগণের কাছে মুদ্রাবিষয়ক বিষয়গুলো তুলে ধরা উচিত, যার ফলে জনগণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবে না। এর প্রশাসনিক নিয়োগের বর্তমান ধারা পরিবর্তন করা উচিত এবং একে অর্থ-মন্ত্রণালয়ের স্থলে পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে খোলাবাজার কার-বারের পথ আস্তে আস্তে বেছে নেওয়া উচিত, কারণ এটি কার্যকর তুলনামূলকভাবে। সুদের হারের ব্যাপারে সমীক্ষা চালানো যেতে পারে বাজার শক্তির উপর ছেড়ে দিয়ে, তবে এটি প্রাথমিকভাবে একটি সীমারেখার মধ্যে আবর্তিত হতে দেয়া যেতে পারে মাত্র। আমার এ যুক্তিটি যথেষ্ট বিতর্কিত, যদিও এর পিছনে ভালো তাত্ত্বিক যুক্তি আছে। মুদ্রাগুণক, মুদ্রার প্রচলন হার এবং মুদ্রায়নের ব্যাপারে গবেষণা হওয়া উচিত, যাতে এ গুলোকে মুদ্রানীতি তৈরী ও গ্রহণের মধ্যে বিবেচনা করা যায়। জাতীয় আয়ের পরিবর্তন মনিটারিং করার ব্যবস্থা করতে হবে, যেন যে বৎসর এটি হ্রাস পায় সে বৎসর মুদ্রা সরবরাহকে আনুপাতিক হিসেবে কমানোর প্রয়াস চালানো যায়। শেষ কথা হিসেবে বলা যায়, সরকারের ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন বন্ধ করা উচিত। এটার জন্য আইনত কার্য পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে (অনেক দেশে আইন করে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করাকে নিষেধ করা হচ্ছে), কমপক্ষে যা করা যেতে পারে তা হলো, ঘাটতি বাজেটের একটি সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেয়া।

পাদটীকা

১. Friedman (1968) pp. 12, and 16.
২. Ibid ; p. 16.
৩. Ibid ; p. 5-11.
৪. Friedman (1972).
৫. Friedman (1958).
৬. Friedman (1957).
৭. Sargent and Wallace (1975).
৮. Friedman (1959).
৯. Lucas (1976).
১০. Pl. see Sargent and Wallace (1975).
১১. Pl. see Harberger (Nov. 1978), pp. 505-21..
১২. Siegel (1982), pp. Chapter 6.
১৩. Friedman (1972), p. 29.
১৪. MOF (1985).
১৫. Siegel (1982), pp. 142.
১৬. এ উপাদান কিনসীয় চেতনা থেকে গৃহীত এবং যাঁরা মূল্যস্তর বৃদ্ধিকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা দিতে চান তাঁরা এ উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ; Pl. see Johnson (1966).
১৭. Pl. see Taslim
১৮. Pl. see Sohrabuddin (1985).
১৯. Chandavarkar.
২০. TFYP (1985).
২১. Siegel (1982), Chapter 6.
২৩. Siegel (1982), p. 144-45.
২৪. Ramirez—Rojas ; (1986), p. 35-37.

গ্রন্থপঞ্জী

১. Aghevli, B.B. and M.S. Khan (1978), "Government Deficits and the Inflationary Process in Developing Countries", IMF, *Staff Papers.*

২. Bhatt., V.V. (1974), "Some Aspects of Financial Policies and Central Banking in Developing Countries", *World Development* (Oct.—Dec.).

৩. Chandavarkar, A.G. (1977), "Monetization of Developing

Countries", IMF, *Staff Papers.*

৪. Coat, W.L. Jr. (1977), "The Efficiency of Monetary Rules for LDCs", Mimeograph, IMF (September).

৫. Friedman, M. (1958), "The Role of Monetary Policy", *American Economic Review* (March).

৬. — (1957), Studies in the Quantity Theory of Money, *University of Chicago Press.*

৭. — (1972) The Horowitz Lectures.

৮. Harberger, A. C. (1978) "A Primer on Inflation" *Journal of Money, Credit and Banking* (November).

৯. Johnson H. G. (1966), "Is Inflation the Inevitable Price of Rapid Development or a Retarding Factor in Economic Growth ?" *Malayan Economic Review*, April, and also reproduced in *Leading Issues in Economic Development* ed. by G.M. Meier, *Oxford University Press* (1976).

১০. Lucas, R.E. (1976), "Econometric Policy Evaluation : A Critique", in *the Phillips Curve and Labor Markets* Karl Brunner and Allen Meltzer Eds. (North-Holland).

১১. Maxwell, F J. and R.M. Williams (1984), American Money and Banking *John Wiley and Sons.*

১২. Ramirez, Rojas, C. L. (1986), "Monetary Substitution in Developing Countries", Finance and Development (June).

১৩. Sargent T. J. and N. Wallace (1975), "Rational Expectations, The Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule", *Journal of Political Economy.*

১৪. Sayers, R. S. (1957), "Central Banking in Underdeveloped Countries" *in Central Banking After Bagehat* R.S. Sayers ed. (Oxford, Clarendon Press).

১৫. Sohrab Uddin M. (1986), "A Structural Analysis of Monetary Policy in Bangladesh, 1973-81", *the Journal of Management, Business and Economics*, Dhaka, January.

১৬. — (1987), "Monetary Policy in the Third Five Year Plan (of Bangladesh)", *Bangladesh Journal of Political Economy*, Conference Issue of 1985.

১৭. Siegel, B. N. (1982), Money, Banking and the Economy :

Monetarist View, Academic Press.

১৮. Second Five Year Plan (SFYP) (1980), Ministry of Planning, *Govt. of Bangladesh.*

১৯. Taslim, M.A. (1984), "On Rate of Interest and the Demand For Money in LDCs: the Case of Bangladesh", *The Bangladesh Development Studies* (September).

২০. Third Five Year Plan (TFYP) (1985), Ministry of Planning *Govt. of Bangladesh.*